ছাত্ররাজনীতির পরিশোধন ও সংস্কার আবশ্যক

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

প্রকাশ : ২৯ মে ২০২৩, ০০:২০

বর্তমান ছাত্ররাজনীতি নিয়ে নানাভাবে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, ছাত্ররাজনীতি সাময়িকভাবে হলেও বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। কারণ মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা কোনো সমাধান নয়। বরং মাথাব্যথার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। ছাত্ররাজনীতিতে যদি কোনো অসংগতি বা অনিয়ম থাকে, তা পরিশুদ্ধ করা যেতে পারে। তাই বলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে, আমি এই মত সমর্থন করি না।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশের ছাত্ররাজনীতির একটি গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্ররা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জাতীয় রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি ছাত্ররাও বিরাট ভূমিকা এবং অবদান রেখেছে। প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্ররা সামনের কাতারে ছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্ররাজনীতির ভূমিকা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দ্বীপ্যমান। কারণ আমরা দেখেছি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তখন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এমনকি বঙ্গবন্ধু নিজেই প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির সূচনা করেন ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রভাষা দিবস উদযাপন করেন। সেই দিন তিনি স্বাধীন পাকিস্তানে প্রথম বারের মতো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এরপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলের ২৪ বছরের মধ্যে প্রায় ১২ বছর বঙ্গবন্ধু কারাগারে ছিলেন। বাকি সময় বঙ্গবন্ধু কারাগারের বাইরে ছিলেন। এটা দৃশ্যত সত্যি, কিন্তু বাস্তবে তিনি কার্যত কারাগারেই ছিলেন। কারণ তার পেছনে সব সময় গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন নিয়োজিত ছিল। তাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনভাবে চলাচল করা কিংবা কথা বলাও বিপজ্জনক ছিল। সেই সময়কার গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনসমূহ বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে সংগৃহীত এবং ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আমি মনে করি, বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির সূচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু। অবিভক্ত ভারতে বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র, তখন তিনি ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। আসলে বঙ্গবন্ধু ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমেই জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গবন্ধু যে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে সেই ছাত্রসংগঠন বহু দিন তাদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্ররা সামনের কাতারে থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা এটিও ছাত্রদেরই চিন্তার ফসল। বঙ্গবন্ধু সারা জীবনই বাংলাদেশের বন্ধু ছিলেন। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর একই বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি যখন কারাগার থেকে মুক্তি পান, তার

পরদিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে তিনি ছাত্রদের দ্বারা বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হলেন।

আমরা কেন আজকে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার দিকে যাব? বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্ররাজনীতির গৌরবময় ইতিহাস বিবেচনায় ছাত্ররাজনীতি বন্ধ বা নিষিদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। সারা পৃথিবীতেই ছাত্ররাজনীতি আছে। ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমেই জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। ছাত্ররা ছাত্রদের কল্যাণে, ছাত্রদের মঙ্গলে রাজনীতি করবে এটাই প্রত্যাশিত। এ ধরনের ছাত্ররাজনীতিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। ঔপনিবেশিক আমলে ছাত্রদের তাদের অঙ্গন থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ফ্রান্সের দার্শনিক আন্দ্রে মলরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আজকে পৃথিবীর এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবিত ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে মৃত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। মৃত ছাত্রছাত্রীরা মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোত্সর্গ করে গেছেন।' সেই সময় তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, আপনারা আপনাদের মৃত সহপাঠীদের কবরে শুধু একটি কথা লিখে রাখবেন, 'হে পথিক, আমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের জীবন উত্সর্গ করেছি।' তার এই কথাটি যে কত তাৎপর্যপূর্ণ, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। স্বাধীনতাযুদ্ধে যে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। তারা জীবন দিয়েছেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। নিজেরা কিছু পাওয়ার আশায় নয়। আমরা আজকে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি, তা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য। তারা আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন। সেই বাংলাদেশকে যারা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবেন, তারা যদি রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে তারা দেশের উপযুক্ত নেতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবেন কীভাবে?

ছাত্ররাজনীতি অবশ্যই থাকা দরকার আছে। তবে বর্তমান যে ধারায় ছাত্ররাজনীতি চলছে, তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ছাত্ররাজনীতি পরিশোধন করার প্রয়োজন আছে। ছাত্ররাজনীতি সংস্কার করার দরকার আছে। অতীতে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক দলের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বঙ্গবন্ধু যখন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, তখন ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের অংশ ছিল না। তারা ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। কোনোভাবেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ছাত্রলীগ তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব নিজেরাই নির্বাচন করেছে। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের নেতা নিজেরাই নির্বাচন করেছে। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে তারা আন্দোলন করেছে। অর্থাৎ, তারা একটি স্বাধীন ছাত্রসংগঠন হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সেনাশাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে যখন রাজনৈতিক দল পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বঙ্গবন্ধু-পরবর্তী সময়ে দেশ পরিচালনা করছিলেন, তখন সামরিক ফরমান বলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একটি ছাত্র সংগঠন, একটি যুব সংগঠন, একটি শ্রমিক সংগঠন, একটি মহিলা সংগঠন থাকতে হবে। সামরিক শাসনের কুফল হিসেবে আজকে সব ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক দলের ছায়ায় চলে গেছে, তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে চলে গেছে। সে কারণে দেখা যাচ্ছে, ছাত্ররাজনীতিতে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা মূল যে জাতীয় রাজনৈতিক দল, তার নেতা-নেতৃদের আশ্রয়ে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যদি ছাত্র সংসদের নির্বাচনগুলো নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে, তাহলে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। তার আগে দরকার আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছাত্রসংগঠনগুলোকে পৃথক করে দেওয়া। এটা যদি করা হয়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র

সংসদগুলো সচল করা সহজ হবে। কারণ সেই অবস্থায় কোনো ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা দলীয় পরিচয় দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। তারা নিজস্ব জনপ্রিয়তার নিরিখে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আমি দেখেছি, ইউরোপে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকালীন সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর ছাত্র প্রতিনিধিদের আর্থিক সুবিধাও দিয়ে থাকে। ইউরোপ-আমেরিকায় সবাই নিজস্ব আয় দিয়ে লেখাপড়া করে। নির্বাচনের পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে ছাত্র প্রতিনিধিরা নিজেরা আয় করতে পারে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সম্মানি দিয়ে থাকে। সেই সম্মানি দিয়ে সে তার লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ করে। কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, তারা ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ঠিকমতো ক্লাসও করতে পারে না। অনেক সময় তারা সেমিস্টার পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে পারে না। সে কারণে তাদের পরবর্তী সেমিস্টারে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানে, সে একটি বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করছে। আমরাও চাই আমাদের ছাত্র নেতৃত্বে যারা আসবে, তারা নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো দেখবে। তারা ছাত্রদের কল্যাণে কাজ করবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কাজ করবে।

আমরা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে শুধু আন্তঃদলীয় সংঘর্ষ হচ্ছে তাই নয়, অন্তর্দলীয় সংঘর্ষও হচ্ছে। নিজ দলের মধ্যেই উপদল আছে। তারা মাঝে মাঝেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। আমি পত্রিকায় সংবাদ পড়ে বিস্মিত হই, যখন দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে। এটা কীভাবে সম্ভব? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা ভর্তি হয়। আমরা যখন দেখি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীরা তাদের একজন সহপাঠীকে হত্যা করে, এটা কী করে সম্ভব? প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তো সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা ভর্তি হয়। তাদের পক্ষে এমন কাজ কীভাবে করা সম্ভব? দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে যদি এমন ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলে, তাহলে জাতি হিসেবে আমরা হতাশ হই। বর্তমানে যেভাবে ছাত্ররাজনীতি চলছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের ছাত্ররাজনীতিকে অনেক বেশি পরিশোধন করতে হবে।

আমি আবারও বলছি, আমাদের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। আমাদের সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কোনোভাবেই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ বা সীমিত করে এর সমাধান পাওয়া যাবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই ছাত্ররাজনীতি অব্যাহত থাকুক। তবে ছাত্ররাজনীতির নামে কেউ যাতে কোনো অন্যায় কাজ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হলে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক

অঙ্গনে শূন্যতা দেখা দিতে পারে। ছাত্ররাজনীতির আড়ালে কেউ যদি কোনো অন্যায় কর্ম করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিছুসংখ্যক ছাত্রের কারণে পুরো ছাত্রসমাজের নামে দুর্নাম দেওয়া হোক, এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী একটি দেশের মোট জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ এখনো বেশ কম। তবে সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য। এটা অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ। তার পরও বলব, আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের বাজেটে সব সময়ই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ দক্ষ ও উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ দুটি খাতের বিকল্প নেই। আর একটি দেশের জনসংখ্যাকে যদি কার্যকর জনশক্তিতে পরিণত করা না যায়, তাহলে যে কোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অতিতে নানা কারণে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন সময় এসেছে এ দুটি খাত নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার। আজকের শিশুকে যদি আমরা সঠিক শিক্ষা দিতে না পারি, তাদের যদি শারিরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। সুশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান জাতি একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করছি। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করছি। এসব উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই ও স্থিতিশীল করার জন্য নবীন প্রজন্মকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে একটি দেশের সর্বোত্তম বিনিয়োগ। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর বিকল্প নেই। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে ভালো ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। মেধাবীরা যাতে শিক্ষাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তেমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অনুলিখন : এম এ খালেক